১০৬

তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible]

দৈনিক ইনকিলাব

ইসলামী শিক্ষার সেকাল-একাল

মোহাম্মদ রহিম উল্লাহ

ইসলামী শিক্ষা বলতে আমরা বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বুঝি। অবশ্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আবার পাঠ্যক্রমের বিভিন্নতা রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে বেসরকারী এবং সরকারী মাদ্রাসার শিক্ষা ক্যারিকুলাম। এ উভয় পদ্ধতির শিক্ষার উদ্দেশ্যই ইসলাম এবং ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্যের জীবনযাত্রা বাস্তবায়ন করা। ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায়, উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবন আবদুল মালিক (৭০৫-১৭ খ্রীঃ) ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু ও মুলতান মুসলিম শাসনাধীনে আনেন। এভাবে ইসলামী ভাবধারার উন্নতি হতে থাকে। ১২০৪ খ্রীঃ ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন্ বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। মোঘল বংশের সর্বশেষ শাসকের সময় ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের দখলে আসে এ ভারতবর্ষ। তখন থেকেই ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য শিক্ষা.... ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে ১৮৩৫ সালে প্রবর্তিত লর্ড মেকলের চিন্তাধারার ফল। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন, যা সরকারী পাঠ্যক্রমভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো। এটি করার পিছনে তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ছিল। যাতে করে সমাজের একটা বিরাট অংশকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখা যায়। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, "কালিমাতু হক্কিন উরীদুবিহাল্ বাতিল" অর্থাৎ কথা সত্য, কিন্তু উদ্দেশ্য খারাপ, যা আমরা তার বক্তব্য থেকে অনুধাবন করতে পারি। তিনি বলেছেন, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons indians in blood and colour but english in taste in openion in morals and intellect. অর্থাৎ বর্তমানে আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা যায়, যারা আমাদের ও লাখ লাখ মানুষ তাদের। আমরা শাসন করছি তাদের যেন তারা ঐসব লোকদের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারে। এরা এমন এক ধরনের মানুষ হবে, যাদের রক্তে ও গায়ের রঙ হবে ভারতীয় কিন্তু মেজাজে, চিন্তা-ভাবনায়, নৈতিকতা ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।

এর পাশাপাশি ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর অফিস-আদালতে ফার্সীর প্রচলন নিষিদ্ধ করে ইংরেজী চালু করার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এভাবে বরাবরই প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র, অবজ্ঞা, অবহেলার শিকার হয়ে আসছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষক এবং শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি কিছুটা হলেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তারপর জমিয়াতুল মুদাররেছীনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এরশাদ সরকারের আমলের বাংলাদেশের সাবেক ত্রাণ ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা এম এ মান্নানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিকায়ন করে সাধারণ শিক্ষার মানে বরং তার চেয়ে আরও মানসম্মত ক্যারিকুলাম প্রস্তুত করে মাদ্রাসার দাখিল এবং আলিম শ্রেণীকে যথাক্রমে এসএসসি এবং এইচএসসির মান প্রদান করা হয়। সাথে সাথে বিজ্ঞান বিভাগও চালু করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিষয়ে তারা ভর্তি হচ্ছে, বুয়েট, মেডিকেল, পিএসসি (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সকল ক্ষেত্রে তারা অগ্রগামী। পিএসসির গত বছরের জরিপ রেকর্ডে দেখা গেছে, মাদ্রাসার ছাত্রই রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম [illegible] ইউজিসি (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন)-এর রিপোর্টেও দেখা যায় যে, মাদ্রাসা background-এর ছাত্ররাই সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ আলী, শাহ আজিজুর রহমান, স্পীকার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল জাব্বার, বিচারপতি নূরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট আঃ রহমান বিশ্বাস এবং আরও অনেক গুণীজন এ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং রয়েছেন। দেশকে এতসব মেধা, যোগ্য ব্যক্তি উপহার দেয়া সত্ত্বেও আমরা বরাবরই লক্ষ্য করছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষক এবং তৎসংশ্লিষ্টদের দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। এ বছরের মার্চ মাসে এডাবের চেয়ারপার্সন খুশী কবিরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে মাদ্রাসা শিক্ষা-খাতের ব্যয় কমিয়ে আগামী অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ শিক্ষা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির সুপারিশ করেছেন। গত ২৮ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত বেনবেইসের এক জরিপে দেখানো হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি ৩৭ জন শিক্ষার্থীর ১ জন শিক্ষক আর মাদ্রাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিম পর্যায়ে প্রতি ২৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক। তার মানে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র কম, সেখানে সরকারের অর্থ অপচয় হচ্ছে। তাহলে তার কারণ কোথায়? এর জন্য দায়ী কে?

সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইমারী থেকে সরকারী সকল সহযোগিতা, বিনামূল্যে বই প্রদান, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, মাঝেমধ্যে পোশাকাদি প্রদান, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের নেক নজর আছে বলে আপনি বলবেন? বিবেকবান হলে তা পারবেন না। এখানে দু'পদ্ধতির ব্যবস্থার গোড়াপত্তনেই নীতিবৈষম্য।

বাংলাদেশে জনসাধারণের ৮৫% ভাগই হচ্ছে কৃষক, গরীব তারা উপস্থিত সুবিধাদির কথা চিন্তা করে এসব অনুদানের দিকে চেয়ে সন্তানদের পাঠান প্রাইমারীতে। অপরদিকে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের সাহায্য-সহায়তায় আধপেটা যে ইবতিদায়ীর শিক্ষক শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতির কারণে আন্তরিকভাবে জ্ঞান দান করছেন। শিক্ষার উপকরণ, আর্থিক সাহায্য না পাওয়ায় অভিভাবকরাও এ শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বা তৎসমমানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম, বেশীর জন্য এ প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। কারণ শিক্ষার্থীরা প্রাইমারীতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে। সেখান থেকে সোজা হাইস্কুলগুলোতেই যায় একটি বৃহৎ অংশ। আর পাহাড়সম সমস্যাকবলিত অভিভাবকরা উপায়ন্তর না পেয়ে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান। তাদের ধারণা, এ শিক্ষা গ্রহণের তুলনামূলক ব্যয় কম, তাছাড়া পড়ালেখার সাথে সাথে দ্বীন শিখবে, শুধু দুনিয়াই তো শেষ নয়, আখিরাত তো ভাবতে হবে- তাই।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে পাস করার পরও কর্মক্ষেত্রের তেমন প্রসারতা নেই, যতটা ব্যাপকতা রয়েছে সাধারণ শিক্ষিতের ক্ষেত্রে। এসব সমস্যা উত্তরণের পথ হিসেবে যদি প্রাইমারী শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেয়া যেত ইবতিদায়ী শিক্ষার আর ফাজিল এবং কামিল শ্রেণীকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে অথবা মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকাকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে তার অধীনে যথাক্রমে বিএ ও এমএ-এর মান প্রদান করে এসব শিক্ষার্থীদের বিসিএস-এর সুযোগ প্রদানসহ অন্য সকল সুবিধাদি প্রদানকরণ এবং শিক্ষা পৃষ্ঠপোষকদের একচোখা নীতি পরিহারকরণ একান্ত আবশ্যক।

বাংলাদেশের ৯০% ভাগ মানুষ মুসলমান। কাজেই শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি-পদ্ধতি দেশের ৯০% ভাগ তাওহিদী জনতার মান্-মানস্, বিশ্বাস-আদর্শের পরিচর্যায় হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। পরিশেষে ঐতিহাসিক উইলিয়াম হান্টারের লেখা 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেন, "তৎকালীন যুগে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরাই ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি।"

তিনি আরও বলেন, "মুসলমানরা এককভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী ছিলেন, যা আমাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা হতে কোন অংশেই অবজ্ঞার যোগ্য ছিল না।" সুতরাং ১২ কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের সৃজনশীল এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সুদৃষ্টি দেয়ার প্রত্যাশাই আমরা করি।

লেখক : লেকচারার, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।